*History and Heritage*, Journal of the Department of Islamic History and Culture, University of Dhaka
ISSN: 3008-1653; Vol. 01, December, 2024; DoI: 10.70775/HnH/V010008

# নেপালে বাঙালি মুসলমানদের বসতি: একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

## (Settlement of Bengali Muslims in Nepal: A Historical Review)

মো. ওসমান গনী*

**Abstract**

The history of Muslim settlement in Nepal is a well-known fact. In 712 AD, the wave of Muhammad bin Qasim's conquest of Indus swept the entire subcontinent. Since then, Sufi saints have arrived in Himalayan Nepal to spread Islam. For business reasons later, many Muslims traveled to Tibet through Nepal to preach Islam. Muslims also infiltrated Nepal through Tibet, south of China. However, the migration of Bengalis to Nepal is a surprising phenomenon. Bengali immigration may have been a factor in the invasion of Nepal by Sultan Shamsuddin Ilyas Shah of undivided Bengal in 1342 AD. Another reason is the good governance of Bengal during the reign of Hossain Shahi Sultans (1492-1538). During the Mughal period, regional migration of subjects was a common phenomenon. Hence, as the religion of Islam expanded during that time, the area of residence of Bengalis also expanded. But what can be determined is that their oppression during the British rule, especially in indigo farming forced the Bengalis to leave the land. The promulgation of the Fifth Act of 1830 left the subjects helpless. In the endless persecution of the Nilkuthials especially: the people of the greater Rajshahi region gradually infiltrated into Nepal. Kashmiris, Newaris, Gorkhas, Pashtuns as well as Bengali Muslims living simultaneously in present day Nepal amazes us. Living in Nepal with special status and rights is a matter of pride for Bengalis. In this research paper, some undisputed issues of immigration and social culture will be presented in the light of history.

মূল শব্দ: নেপাল, বাঙালি, মুসলিম, অভিবাসন।

নেপালে মুসলিম বসতির ইতিহাস সুবিদিত ঘটনা। ৭১২ খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মদ বিন কাসেমের সিন্ধু বিজয়ের ঢেউ সমগ্র উপমহাদেশে আছড়ে পড়ে। ইসলাম প্রচার ব্যপদেশে তখন থেকে হিমালয়কন্যা নেপালে সুফি-সাধকদের আগমন ঘটেছে। ব্যবসায়িক কারণে পরবর্তীতে বহু মুসলমান নেপাল হয়ে তিব্বত গমনকালে ইসলাম প্রচারে করেছেন।[১] চিনের[২] পশ্চিম দক্ষিণের তিব্বত হয়েও নেপালে মুসলমানদের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। তবে নেপালে বাঙালিদের অভিবাসন এক চমকপ্রদ ঘটনা। ১৩৪২ খ্রিস্টাব্দে অবিভক্ত বাংলার সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের নেপাল আক্রমণের ফলে বাঙালির অভিবাসন একটা কারণ হতে পারে। আর একটি কারণ হোসেনশাহী সুলতানদের আমলে (১৪৯২-১৫৩৮) তদানীন্তন বাংলার সুশাসন। মুঘল যুগে অঞ্চল বিশেষে প্রজাবৃন্দের রাজ্যময় গমনাগমন ছিল সাধারণ ঘটনা। সেসূত্রে, সেকালে যেমন ইসলাম ধর্ম সম্প্রসারিত হয়েছে তেমনি বাঙালিদের বসবাসের ক্ষেত্রও প্রসারিত হয়েছে। তবে যে বিষয়টি প্রনিধাণযোগ্য তাহলো, ব্রিটিশ শাসনামলে তাদের

* **প্রফেসর ও ডিন, স্কুল অব আর্টস,** এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা। ই-মেইল: drghani@ad.ac.bd

অত্যাচারে বিশেষতঃ নীলচাষে অপরাগতা বাঙালিদের ভিটেমাটি ছাড়তে বাধ্য করেছে। ১৮৩০ সালের পঞ্চম আইন জারীর ফলে প্রজাবর্গ অসহায় হয়ে পড়ে। নীলকুঠিয়ালদের সীমাহীন অত্যাচারে বিশেষতঃ বৃহত্তর রাজশাহী অঞ্চলের মানুষ ক্রমান্বয়ে নেপাল অনুপ্রবেশ করে। বর্তমান নেপালে কাশ্মেরি, নেওয়ারী, গোর্খা, পশতুনদের পাশাপাশি বাঙালি মুসলমানদের যুগপৎ বসবাস আমাদের চমৎকৃত করে। বিশেষ মর্যাদা ও অধিকার নিয়ে নেপালে বসবাস বাঙালিদের জন্য শ্লাঘার বিষয় বটে। অত্র গবেষণা প্রবন্ধে ইতিহাসের আলোকে তদীয় অভিবাসন ও সমাজ সংস্কৃতির অনালোচিত কতিপয় বিষয় উপস্থাপন করা হবে।

দক্ষিণ এশিয়ার দেশ নেপাল। অন্ততঃ হাজার বছর থেকে নেপালের সাথে বাংলা ও বাঙালির একটি অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের বিষয়ে জানা যায়। নেপালের রাজদরবারের গ্রন্থশালা হতে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৯০৭ সালে চর্যাপদের প্রাচীন পুঁথি আবিষ্কার একটি অনন্য ঘটনা। চর্যাপদ সম্পূর্ণ বাংলা ভাষায় রচিত হয়।[৩] চর্যাপদে বাংলা ও বাঙালির গভীর সম্পর্ক তুলে ধরা হয়।[৪] বেশ ক্ষুদ্র আয়তনের দেশ নেপালের ভূমিরূপ অত্যন্ত বিচিত্র ও মনোহরা। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি ও ধর্মীয় নান্দনিক উপসনালয়ে ভরপুর দেশটি যেন পবিত্রতার প্রতীক। উত্তরে চিন ও দক্ষিণে ভারতের বিহার, উত্তর প্রদেশ ও পশ্চিমের উত্তরাখণ্ড যেন দেশটিকে আগলে রেখেছে। এ জন্য অনেকে দেশটিকে ল্যান্ড লক্ড কান্ট্রি (Land Locked Country) নামে অভিহিত করে থাকেন।

বিশ্বব্যাপী ইসলামের বিস্তার ধর্মের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। হাজ্জাজ বিন ইউসুফের ভ্রাতুষ্পুত্র মুহম্মাদ বিন কাশিমের সিন্ধু অভিযান কিংবা সুলতান মাহমুদের সতের বার ভারত আক্রমণের ঘটনা দু'টোতে সমগ্র উপমহাদেশে ইসলামের বীজ উপ্ত হয়। সিন্ধু হয়ে কাশ্মির, অত:পর নেপাল হয়ে লাসার পথে চিন গমনাগমন ইসলামকে পরিচিত করে তোলে। ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, আব্বাসীয় খলিফাদের আমলে চিনের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজির তিব্বত অভিযানেও নেপালসহ এতদঞ্চলের মানুষ ইসলামের সংস্পর্শে আসে। অনেকের অভিমত, ইখতিয়ার উদ্দীন তিব্বত অভিযানে ব্যর্থ হলে তাঁর সৈন্যদের একটা দলছুট অংশ নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য নেপালে গমন করেন এবং বসতি গড়ে তোলেন। এসব দলছুট সৈন্যদের মাঝে আফগান-তুর্ক বংশোদ্ভূত মানুষ ছিল, তেমনি ছিল উৎসাহী সাহসী বাঙালি জনতা।

অভিবাসনের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ কতিপয় উল্লেখযোগ্য কারণ অনুঘটক হিসেবে কাজ করে। পেশাগত সুবিধা নারী শিশুদের জন্য নিরাপদ আশ্রয়, বর্ধিষ্ণু অর্থনীতি, জীবনমান ও তার ধরন, উন্নত জলবায়ু অন্যতম। এছাড়া প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও বৈচিত্রময় আবহাওয়া ইত্যকার বিষয়াদিও অভিবাসনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নেপালে সকল সুবিধা বিদ্যমান থাকায় নানা উপায়ে মানুষ নেপালে পাড়ি জমায়। পার্শ্ববর্তীদেশ হওয়ায় স্বাভাবিকভাবে নেপালে বাঙালীরা সে সুযোগ নেয়।

নেপাল একত্রীভূতকরণের পর রাজা পৃথ্বীনারায়ণ শাহ মুসলিম ব্যবসায়ীদের স্বপরিবারে বসতি স্থাপন করতে উৎসাহিত করেছিলেন। বাণিজ্য ছাড়াও যোদ্ধাবেশে আগত দলছুট মুসলমানরা বন্দুক, কার্তুজ ও কামান তৈরীতে বিশেষজ্ঞ ছিল। নবাবদের সৈন্য বাহিনী কিংবা দরবারে চাকুরীর সুবাদে বিশেষতঃ ফার্সী ও আরবি ভাষার এরা পারদর্শী ছিল। আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে ছিলেন দক্ষ। সবমিলিয়ে একটি রাষ্ট্রের অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখার জন্য বাঙালী মুসলমানদের বড়ই প্রয়োজন ছিল। শাহ পরিবার অত্যন্ত দক্ষতার সাথে বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়ে অভিবাসনের দ্বার উন্মুক্ত রেখেছিলেন। মানবিক গুনাবলীর অধিকারী শাহ পরিবার দুর্ভিক্ষ কবলিত বিহারের[৫] কৃষিজীবদের আশ্রয় দেন। দক্ষিণপূর্ব নেপালে

কৃষিখাতের উন্নয়নের জন্য ব্যাপক ভাবে অভিবাসিত হতে থাকে। অবিভক্ত বাংলা ও বাংলাসন্নিহিত নেপালের জন্য মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর উক্তি প্রনিধান যোগ্য। তিনি তার চন্ডিমঙ্গল কাব্যে উল্লেখ করেন, 'আমার নগরে বৈস, যত ইচ্ছা চাষ চষ, তিন সন বহি দিহ কর'।[৬] অর্থাৎ- জমি যত দরকার চাষ করো। তিন বছর পর কর দাও। নেপালের তদানীন্তন শাসক শাহ পরিবারের সিদ্ধান্তে নেপালে প্রবেশের দ্বার উন্মোচিত হয়। কৃষিখাতে ব্যাপক উন্নতি হয়। এভাবে পূর্ব তরাইয়ের পারসা, বারা, রাউতহাট, মাহোত্তরি, সাপ্তারি ও মরং থেকে প্রচুর রাজস্ব সংগ্রহ শুরু হয়। অভিবাসিত দু:সাহসী মানুষেরা বন্যজন্তু শিকার বিশেষত হাতি ও গন্ডার শিকারের ক্ষেত্রে দক্ষতার পরিচয় দেয়। বিশ্ববাজারে এসব প্রাণীর দাঁতের খুবই চাহিদা ছিল। আঠারো শতকের শেষ অবধি প্রতিবছর ২০০-৩০০ হাতি ধরা হতো। এমনিভাবে অভিবাসিগণ নেপালের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

রাজনৈতিকভাবে নেপালের সাথে বাংলার সম্পৃক্ততার ইতিহাস বড়ই চমকপ্রদ। ১৩৪২ খ্রিস্টাব্দে হাজী ইলিয়াস শাহ ফিরূজাবাদের সুলতান আলাউদ্দিন আলী শাহকে হত্যা করে সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে রাজ্য সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেন। ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দে ইলিয়াস শাহ নেপাল বিজয়ের জন্য উদ্যোগী হন। নেপালের মতো দুর্গম গিরিরাজ্য[৭] আক্রমণের অভিলাষ সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। তবে রাজ্যসীমা বিস্তার ও বিপুল সম্পদ লাভের দুর্নিবার আকর্ষণ তাঁকে নেপাল জয়ে প্ররোচিত করতে পারে। সম্ভবতঃ মধুবনী বা উত্তর দ্বারভাঙ্গা অঞ্চলেই তিনি নেপালের বিপুল ঐশ্বর্যের কথা শুনেছিলেন। কোন পথে যে বাংলার সৈন্য কাঠমান্ডুতে উপস্থিত হয়েছিলেন তার কোনো উল্লেখ নেই। নেপাল রাজবংশাবলীতে উল্লিখিত আছে, ৪৬৯ নেওয়ারী সম্বৎ বা ১৩৪৯ খ্রিস্টাব্দে নেপালের রাজা জয়রাজ মল্ল পশুপতি নামের কোষ থেকে অর্থ গ্রহণ করেন। তারপরে পূর্ব দেশের (বাংলার) সুরত্রান (সুলতান) সমসদীন (শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহ) নেপালে এসে পশুপতি নাথকে তিনখণ্ড করেন এবং সমস্ত পুড়িয়ে দেন। কাঠমন্ডুর অদূরে স্বয়ম্ভুনাথ মন্দিরের এক শিলালিপিতে ইলিয়াস শাহের নেপাল আক্রমণের তারিখ ৪৭০ নেওয়ারী সম্বৎ বা ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দরূপে উল্লেখ করা হয়েছে।[৮]

সংস্কৃত ভাষায় উৎকীর্ণ শিলিলিপিটির পাঠ নিম্নরূপ :

সপ্তত্যভ্যধিকে শ্রীমন্নেপালাব্দ চতঃশতে।
মার্গশীর্ষে সিতে পক্ষে দশম্যাং গুরুবাসরে ॥
সুরত্রান সমসদীনো বঙ্গাল বহুলৈ বলৈঃ।
সহাগত্য চ নেপালে ভগ্নো দগ্ধশ্চ সর্বশঃ ॥

এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, ৪৭০ নেওয়ারী সম্বৎ বা ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দে অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষের দশমী তিথিতে বৃহস্পতিবারে শামসুদ্দীন নেপাল আক্রমণ করে ছারখার করেছিলেন। প্রাচীন ললিতপুরী বা পাটনের লিপিতে শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহের নেপাল আক্রমণের কথা এভাবে বলা আছে—

শ্রুতান সমসদীন যবনা ধিরাজঃ
নেপাল সর্বনগরং ভস্মীকরোতি।[৯]

ঐতিহাসিক জয়সওয়াল বলেন, ইলিয়াস পশুপতিনাথ মন্দিরের ধনরত্নও লুণ্ঠন করেছিলেন।[১০] যাহোক, ইলিয়াস দীর্ঘকাল কাঠমন্ডুতে অবস্থান করেননি। সম্ভবতঃ পার্বত্য যুদ্ধের অনিশ্চিত ফলাফল সম্বন্ধে

মুসলিম সৈন্যবাহিনী সন্দিহান হয়ে পড়েছিল। কিংবা কাঠমন্ডুর দুর্গম পার্বত্য উপত্যকায় সমতলের সেনাবাহিনীর রণকৌশল প্রদর্শনের কোনো সম্ভাবনা নেই বিবেচনা করে ইলিয়াস স্বল্পকালের মধ্যে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। অমিতচেতা ইলিয়াস কিন্তু নেপাল আক্রমণ করেছিলেন, আকস্মিকভাবে, কতকটা সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছিলেন বলা যায়।

নেপাল জয়ের আগেই ইলিয়াস শাহ ত্রিহুতের (উত্তর বিহার অঞ্চল) বেশ কিছু অঞ্চল জয় করেছিলেন। ত্রিহুত এ সময়ে অর্ন্তদ্বন্দ্বে ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়েছিল। সমগ্র রাজ্যটি দু'জন প্রতিদ্বন্দ্বী রাজার মধ্যে বিভক্ত হয়েছিল। হরিসিংহদেবের পৌত্র শক্তিসিংহ উত্তরাংশের অধিকারী হয়েছিলেন। তাঁর রাজধানী ছিল শিমরাঁও। দক্ষিণাংশের অধিকারী ছিলেন কামেশ্বর; তিনি ছিলেন দিল্লীর সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের মনোনীত। তার রাজধানী ছিল দ্বারভাঙ্গা অঞ্চলের মধুবনীতে। বস্তুতঃ এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর আত্মকলহের সুযোগে ইলিয়াস ত্রিহুতের বেশ কিছু অংশ জয় করে নেন। সে ধারাবাহিকতায় উৎসাহী সৈন্যরা নেপাল অবধি বাংলার স্বাধীন সালতানাতের বিস্তার সাধন করেছিলেন।

সুলতান ও শাসকরা সরাসরি ধর্মপ্রচারে সংযুক্ত হতেন না; কিন্তু প্রচারক কিংবা ধর্মানুরাগীদের পৃষ্ঠপোষকতা দান করতে কার্পণ্য করতেন না। বিজয়ীর বেশে তাঁরা যেখানেই গিয়েছেন, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ভাগ্যান্বেষী যোদ্ধা ও অনুসারীগণ সহগমন করেছেন। গড়ে তুলেছেন সমমনাদের সমাহারে উপনিবেশ। সাতগাঁ, সোনারগাঁও ও লাখনৌতি একত্রীকরণ ইলিয়াস শাহের অবিস্মরণীয় কীর্তি। তিনি বাংলাদেশের তিন অঞ্চলের অধীশ্বর হন অর্থাৎ- তিনি সমগ্র বাংলাদেশের অধীশ্বর হন। তাঁর পূর্বে বাংলার আর কোনো মুসলমান সুলতান সমগ্র বাংলার সুলতান হবার গৌরব অর্জন করেননি। এ কারণেই তিনি 'শাহ-ই-বাঙ্গালী', 'শাহ-ই-বাঙ্গালীয়ান' এবং 'সুলতান-ই-বাঙ্গালা' উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন।[১১] ইলিয়াস শাহের নেতৃত্বে নেপাল বিজয় ছিল একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা।

উত্তর বিহার অঞ্চলে মুসলমানদের বসতি স্থাপনে ইলিয়াস শাহের বিজয় অভিযান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ক্রমশঃ নেপাল অবধি তার বিজয় সম্প্রসারিত হলে নেপাল অঞ্চলে মুসলমানদের বসতি বিস্তার অব্যাহত থাকে। বাঙালি মুসলমানদের নিকট আগ্রহের স্থান হিসেবে পরিগণিত হয়। কালক্রমে উত্তর ভারত সংলগ্ন নেপাল অঞ্চলে মুসলমান বিশেষতঃ বাঙালি মুসলমানদের যাতায়াত শুরু হয়। নিরাপদ ও চমৎকার নৈসর্গিক পরিবেশে আপ্লুত আবেগপ্রবণ বাঙালি সমাজ বসতি স্থাপন শুরু করে।

স্বাধীন সালতানাতের পুরো সময়টা (১৩৩৮-১৫৩৮) জুড়ে অবিভক্ত বাংলায় মুসলমান ও হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সাথে আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে উঠে। পরধর্মমত সহিষ্ণুতার রাখী বন্ধনে আবদ্ধ হয়। বিশেষতঃ সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের সময় তা পূর্ণতা পায়। হোসেন শাহ নিষ্ঠাবান মুসলমান হলেও হিন্দুদের প্রতি তিনি উদারনীতি পোষণ করতেন। তিনি বহু হিন্দুকে উচ্চ রাজপদে নিয়োগ দেন। রূপ ও সনাতন নামক দুই ভাই তার মন্ত্রী ছিলেন। রূপের উপাধি ছিল 'দবীর-ই-খাস' এবং সনাতনের উপাধি ছিল 'সাকর মল্লিক'। এদের বড় ভাই রঘুনন্দন এবং ছোট ভাই রাজ বল্লভ ও উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত ছিলেন। বল্লভের উপাধি ছিল 'অনুপম মল্লিক'। রূপ সনাতনের ভগ্নিপতি শ্রী কান্তরাজ সরকারি চাকুরি করতেন। ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ জাতি-ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলের প্রতি সদয় ছিলেন। বৈষ্ণব ভাবনার পথিকৃত শ্রী চৈতন্য বাংলা অতিক্রমকালে সুলতান কর্তৃক সমাদৃত হন। শ্রী চৈতন্যকে প্রটোকল দেয়ার জন্য রূপ-সনাতন ভ্রাতৃদ্বয়কে রামকেলি গ্রামে প্রেরণ করেন। তার সুশাসনে সাম্রাজ্যব্যাপী চরম শান্তি বিরাজ করছিল।[১২] আমাদের ধারণা, এ সময়কালেও বিহার সন্নিহিত নেপাল অঞ্চলে বাঙালি মুসলমানদের অভিবাসন অব্যাহত ছিল। ১৫৩৮

খ্রিস্টাব্দে স্বাধীন সালতানাতের অবসানের পর মুঘলদের (১৫২৬-১৮৫৮) অনুপ্রবেশের ফলে বাংলা পুনর্বার দিল্লীর কর্তৃত্বাধীনে আসে। সুলতানী আমলের ভৌগলিক অখণ্ডতা মুঘল আমলেও অব্যাহত ছিল। উপরন্তু মুঘলদের উদারনীতি সমগ্র সাম্রাজ্যে একাকার হয়ে টিকে থাকার বার্তা স্পষ্ট হয়ে উঠে।

মুঘলদের (১৯২৬-১৮৫৮) রাষ্ট্র পরিচালনায় উদারনীতি বর্হিদেশীয় বাণিজ্যিক কোম্পানীগুলোকে আকৃষ্ট করে। পরবর্তীতে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে সমগ্র উপমহাদেশের 'বণিকের দণ্ড রাজদণ্ডে' পরিণত হয়। 'ভাগ কর ও শাসন কর' নীতির আওতায় ইংরেজরা সফলভাবে প্রজা শাসনে সক্ষম হয়। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে বাংলায় ব্যাপক অরাজকতা সৃষ্টি হয়। রবার্ট ক্লাইভ প্রবর্তিত দ্বৈত-শাসন ব্যবস্থায় নবাবের দায়িত্ব ছিল; কিন্তু কোনো ক্ষমতা ছিল না। অর্থের জন্য তাঁদের কোম্পানীর দয়ার উপর নির্ভর করতে হতো। যার ফলে অর্থের অভাবে প্রয়োজনের সময় নবাব কোনো ব্যবস্থাই নিতে পারতেন না। তাঁরা ছিলেন ইংরেজদের আজ্ঞাবহ। ফলে জনসাধারণের নিকট তাদের কোনো গুরুত্ব ছিল না। এতে দেশে চরম শাসন-বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি দেখা দেয়। দ্বিতীয়তঃ কোম্পানির অস্বাভাবিক মুনাফা প্রসূত রাজস্বনীতি এবং এর ফটকাবাজ দালালদের অর্থ লালসা ও অন্যায়মূলক কার্যকলাপ বাংলার দুর্দশাগ্রস্ত কৃষকদের মধ্যে অসন্তোষের উদ্রেক করে। তৃতীয়তঃ বাংলা ১৭৭৬ সালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের ফলে প্রজাসাধারণের দুরাবস্থা অত্যন্ত চরমে পৌঁছে। দেশে চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি ও অন্যান্য অপরাধের সংখ্যা ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়। চতুর্থতঃ পরবর্তীতে নবাবের সৈন্য বাহিনী ভেঙ্গে দেয়ার ফলে বহুলোক বেকার হয়ে পড়ে এবং কর্মস্থানের ক্ষেত্র সংকুচিত হওয়ায় অনেকেই চুরি ডাকাতি করে জীবিকা নির্বাহের পথ বেছে নেয়। গ্রাম বাংলার শান্ত সমাজে অস্থিরতা দেখা দেয়। পরিবার পরিজন নিয়ে শান্তিতে বেঁচে থাকার তাগিদে নিজ এলাকা ছেড়ে অন্যত্র বসতি স্থাপন করে। এদের অধিকাংশই নেপালকে বেছে নেয়।

বাংলার গ্রামীণ সমাজ জীবনে অস্থিরতার অন্যতম কারণ ছিল ইংরেজ মুনাফাখোর বেনিয়াদের বাণিজ্যিক নীতি ও নীল চাষ। ১৭৭৭ সালে বাংলায় প্রথম নীলচাষ শুরু হয় এবং লুইস বোনার্ডকে প্রথম নীলকর মনে করা হয়। লুইস বোনার্ড ১৭৭৭ সালে আমেরিকা থেকে প্রথম নীলবীজ ও আধুনিক চাষের পদ্ধতি এদেশে নিয়ে আসেন। অষ্টাদশ শতকের শেষ এবং উনিশ শতকের প্রথমভাগে ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লবের ফলে সেখানকার বস্ত্র শিল্পে নীলের চাহিদা দেখা দেয়। বিপুল মুনাফার কথা অবহিত হয়ে বহু কর্মচারী, সরকারি আমলা চাকুরি ছেড়ে নীলচাষের কারবারে আত্মনিয়োগ করে। মুহম্মদ ইউসুফ হোসেন লেখেন:[১৩]
কোম্পানি লাভের সম্ভাবনা দেখে শীঘ্রই সমস্ত কারবার হস্তগত করে নেয়। এক হিসাব থেকে দেখা যায়, ১৮০৩ সাল পর্যন্ত নীল চাষে যে খরচ হত, তার সবটাই কোম্পানি অল্প সুদে অগ্রিম প্রদান করত। এতে যে নীল উৎপাদিত হত, তার সবটাই যেত ইংল্যান্ডে এবং কোম্পানি বহুগুণ বেশি লাভ করত। এই ব্যবসা এতই লাভজনক ছিল যে, বহু দেশীয় জমিদার ও মহাজন ব্যক্তিগতভাবে বা যৌথ মালিকানায় কারবার খোলে এবং ১৮১৫ সালের মধ্যে নদীয়া, যশোর, খুলনা, ২৪ পরগণা, বগুড়া, রাজশাহী, মালদহ, নাটোর, পাবনা, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, বরিশাল প্রভৃতি জেলায় অসংখ্য নীলকুঠি গড়ে ওঠে। এসব এলাকার নীলের খ্যাতি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। মধ্যবঙ্গের উৎকৃষ্ট নীলের ব্যবসা করে রাতারাতি ধনী হবার কাহিনি সকল ধনিক ও বণিক সম্প্রদায়কে আকৃষ্ট করে। অচিরেই অসংখ্য কুঠি ও কারখানা গড়ে ওঠে। ক্রমশঃ ফরাসি. ডাচ, পূর্তগীজ, দিনেমার প্রভৃতি দেশের ধনিক গোষ্ঠীও দলে দলে নীল চাষ প্রবণ এলাকাগুলোতে পাড়ি জমায়। ফলশ্রুতিতে নীলচাষ বিস্তৃতির খড়গ এলাকার কৃষক শ্রমিকের উপর জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসে।

ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, উর্বরা বাংলায় ব্রিটিশ ক্ষমতা সম্প্রসারণের সাথে সাথে নীলচাষের ক্ষেত্র মুর্শিদাবাদ ও মালদহ এলাকায় বিস্তার লাভ করে। নীলকররা কৃষকদের উৎকৃষ্ট জমিতে নীল বুনতে বাধ্য করত। নীল ছাড়া অন্য কোনো শস্য উৎপাদন করতে দিত না। দাদনের টাকা দেয়ার সময় শর্ত সাপেক্ষে চুক্তি পত্রে টিপসই দিতে হত। চুক্তি অনুযায়ী কাজ না করলে চাষীর উপর চালানো হত অকথ্য অত্যাচার। তদুপোরি ১৮৩০ সালে পঞ্চম আইন জারি হয়। এ আইনের বলে নীলকরেরা আরো শক্তিশালী, দূর্বিনীত ও বেপরওয়া হয়ে উঠে। নীল চাষ না করতে চাইলে কৃষকের উপর বিভিন্নভাবে নির্যাতন চালানো হতো। আনোয়ার হোসেন লেখেন:[১৪] নীলচাষে সামান্যতম আপত্তি করলেই চাষীদের প্রথমে বেত্রাঘাত, এরপর মাথার উপর কাদা দিয়ে নীলের বীজ বুনে দেয়া হতো। চারা না গজানো পর্যন্ত তা মাথা থেকে নামানো হতো না। এতেও কোন কাজ না হলে তাদের ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করা হতো। আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়া হতো বাড়িঘর।

অত্যাচারের ভয়ে ভীত বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেলে রেহাই হত না– তাদের ভিটেমাটিতে নীল চাষ করা হত। কারো কারো বাড়ি ঘর আগুনে পুড়িয়ে দেয়া হত। প্রতিটি নীলকুঠিতে ছিল কয়েদখানা। সেখানে তাদের বন্দী করে চলতো নিদারুণ অত্যাচার। এমনি একটা অবর্ণনীয় অতাচারে জর্জরিত মানুষ দেশান্তর হয় এবং এদের অধিকাংশই নেপালে আশ্রয় গ্রহণ করে।

ব্রিটিশদের নিপীড়নে সবচাইতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বাংলা উর্বরাভূমি অধুনা চাঁপাইনবাবগঞ্জ অঞ্চল । এই অঞ্চল কিন্তু ইতিহাস প্রসিদ্ধ সরসাবাদের অন্তর্ভূক্ত পশ্চিমাঞ্চলের একটি সমৃদ্ধ জনপদ। মহ. আব্দুল অহাব বলেন[১৫], শেরশাহবাদিয়া জনজতি মূলতঃ বাঙলা বিহার ও ঝাড়খন্ডের অধিবাসী। বাঙলা বিহার-ঝাড়খন্ডের মিলন মোহনায় একদা সরসাবাদ নামক আর্থভৌগলিক ও প্রশাসনিক স্থানাঞ্চল গড়ে উঠে, সেই ভূখন্ডের ভূমি পুত্রগণ এবং তাদের প্রজন্মরাই সরসাবাদিয়া বা শেরশাবাদিয়া তথা শেরশাবাদী। গঙ্গা-মহানন্দার দোয়াব অঞ্চল (গৌড়অঞ্চল), গঙ্গার দক্ষিণ-পশ্চিম সংলগ্ন এলাকা (উত্তর-পূর্বরাঢ় তথা বাগড়ি অঞ্চলের উত্তরাংশ) এবং মহানন্দার পূর্বেস্থিত বরিন্দ বা বরেন্দ্র অঞ্চলের দক্ষিণাংশ এই বিস্তীর্ণ নদীমাতৃক উবর মৃত্তিকাযুক্ত এবং সুস্বাস্থ্যকর প্রকৃতিযুক্ত ভূখণ্ডে অবস্থিত ছিল সরসাবাদ তথা শেরশাবাদ অঞ্চল।

পদ্মা, মহানন্দা পাগলা বিধৌত এ অঞ্চলে ফি বছর বন্যায় প্লাবিত হত। বন্যা অপসারণের পর প্রচুর পলি জমে জমিকে উর্বর করে তুলতো। এতে ইংরেজদের দৃষ্টি নিপতিত হয়। নীলচাষ ছাড়া খাজনা আদায়ে বর্বরতার দরুণ মানুষ অতীষ্ঠ হয়ে উঠে। জলমহল ইজারা নিয়ে গ্রাম্য মোড়ল মাতব্বরদের সাথে ইংরেজ-পাইক-বরকন্দাজদের সাথে সংঘর্ষ লেগেই থাকতো। কারণ, হিসেবে গরমিল, সই জালকরণ, ঘুষ ও সুদ নিয়ে গ্রামকে সর্বশ্রান্ত ও সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল। এমনিভাবে গোমস্তা, মুৎসুদ্দি, মেঠো আমিন, সদর আমিন, সরকার-তহসিলদার, মাহুত, সহিস, বরকন্দাজ, ওজনদার, পেয়াদা-জামাদার, তাগিদগীর, চৌকিদার, মালি প্রভৃতি কর্মচারীদের হরহামেসা অত্যাচার-নির্যাতন বাংলার পরিবেশকে দুঃসহনীয় করে তুলেছিল।শুধু তাই নয়, যারা, পানি, জ্বালানী, দুধ, দই, মুরগি, মাংস, ডিম সরবরাহ করতো বা সাহেবের ছাগল-ভেড়া চরাতো তারাও ছিল তক্‌মাধারী। এরাও ছিটে ফোঁটা পাবার লালসায় অত্যাচার কর্মে শামিল হতো। নৃতাত্ত্বিকভাবে অবিভক্ত মালদহ মুর্শিদাবাদের মানুষ স্বাধীনচেতা ও সাহসী ছিলেন। কখনো কখনো তারা ইংরেজদের পাইক বরকন্দাজদের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে প্রতিহত করতেন। ঘৃণায় কিংবা ফেরারী হয়ে পরিবার পরিজন সহকারে দেশ ত্যাগ করতেন।

আনোয়ার হোসেনের ভাষায়-[১৬] নীল চাষীদের প্রতি অমানবিক আচরণে ব্যথিত নবাবি আমলে পত্তনি পাওয়া ক্ষয়িষ্ণু জমিদার চৌধুরী বংশের উত্তর পুরুষ দিয়ানাতউল্লাহ চৌধুরী গর্জে উঠেন। পরপর দু'বার তিনি কৃষকদের সংগঠিত করে রামচন্দ্রপুর হাটের (চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার মহারাজপুর গ্রামে অবস্থিত) নীলকুঠি আক্রমণ করে ব্যর্থ হন। এতে লোক ক্ষয় হয়, বিদ্রোহেও ভাটা পড়ে। এরপর ১৮৫৯-৬১ সালে দেশব্যাপী যে নীল বিদ্রোহ হয়েছিল এর জোয়ার এসে পৌছে ছিল রামচন্দ্রপুরের বিদ্রোহীদের দোরগোড়ায়। দিয়ানতউল্লাহ চৌধুরী আবার সংগঠিত করেন কৃষকদের। পূণর্বার আক্রমণ করেন রামচন্দ্রপুরের নীলকুঠি। এবার জয় হয় বিদ্রোহীদের। সাময়িকভাবে পরাস্ত ইংরেজ সাহেব সুড়ঙ্গ পথে পালিয়ে যান। কিন্তু তার স্ত্রী পালানোর সুযোগ না পেয়ে দিয়ানতউল্লাহ চৌধুরীকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়েন। মুহুর্তেই বিদ্রোহের নায়ক ঘোড়া থেকে নেমে ঝাঁপিয়ে পড়েন সাহেবের স্ত্রীর উপর। ধারালো ছোরা দিয়ে ওই নারীর বুক চিরে দেন। মৃত্যুর আগে মেমসাহেব দিয়ানতুল্লাহকে আসামী করে জবানবন্দি দিয়ে যান। এরপর গ্রেপ্তারি পরোয়ানা নিয়ে তিনি এলাকার বেতবাড়িয়ার জঙ্গলে আত্মগোপন করেন। ব্রিটিশ সরকার তাকে ধরার জন্য ১০ হাজার টাকা পুরুস্কার ঘোষণা করে। এরপর দিয়ানতউল্লাহ চৌধুরীসহ ১২ জন বিদ্রোহী ব্রিটিশ শাসনের রক্তচক্ষু এড়িয়ে মাঝেমধ্যে নীলকুঠির উপর ছোট খাটো গেরিলা আক্রমণ চালাতেন। এভাবে ওই জঙ্গলে ১২ বছর লুকিয়ে (আত্মগোপন) ছিলেন। প্রতিহত করেছিলেন নীলকুঠিয়ালদের দৌরাত্ম ও অত্যাচার। নিজেদের মর্যাদা রক্ষার জন্য তারা অসংখ্য পরিবার দেশান্তর হয়েছিলো।

দেশান্তরিত অধিকাংশ পরিবার নেপালে বসতি স্থাপন করে। একটি সূত্রে অবগত হওয়া যায় যে, বিহার রাজ্যের আরারিয়া, মধুবানী, সীতাসার, মতিহারী ও যোগবানী প্রভৃতি স্থান সংলগ্ন পূর্ব দক্ষিণ নেপালে প্রচুর সংখ্যক বাঙালি মুসলমান অভিবাসিত হয়। বিশেষতঃ মধুবানী সংলগ্ন নেপালে উর্দুভাষী ও আরারিয়া সংলগ্ন যোগবাণীতে চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে অভিবাসিত প্রচুর সংখ্যক বাঙালি মুসলমানের বসতি স্থাপনের তথ্য আমাদের চমৎকৃত করে।

মুসলমানদের মাঝে ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রতি আগ্রহবেশী। 'পৃথীবিতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর সম্পদ অন্বেষন কর'[১৭] কোরআনের এ বাক্যে উৎসাহিত হয়ে মুসলমানরা বাণিজ্যে অধিকতর মনোযোগী হয়ে উঠে। কাশ্মীর থেকে ব্যবসায়িক কারণে তিব্বতের লাসা গমনাগমনের রুট হিসেবে নেপালের গুরুত্ব ছিল। কাশ্মিরের খাজা পরিবারের ব্যবসায়-বাণিজ্য পাটনা ও তিব্বতের লাসা অঞ্চলে বিস্তৃত ছিল। বিহারের জনৈক ব্যবসায়ী হাফেজ করমুল্লাহর নেতৃত্বে খাজা পরিবার বাংলা থেকে তিব্বতের লাসা পর্যন্ত ব্যবসায়িক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলেন।[১৮]

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর বাঙালিদের মধ্যে ভীতি ও ঘৃণার উদ্রেক করে। সমগ্র বাংলায় চরম অস্থিরতা সৃষ্টি হয়। কোম্পানীর লোকেরা খাজনা আদায়ের নামে অবাধ লুষ্ঠন ও অত্যাচার শুরু করে দেয়। সে বছর অনাবৃষ্টির কারণে ফসলের উৎপাদন কমে যায়। তদুপরি ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা এবং খাদ্যবাজারে মধ্যস্বত্ব ভোগীদের দৌরাত্নের ফলে অবস্থার চরম অবনতি ঘটে। কোম্পানী শাসনের সহযোগিতায়, খাদ্য শস্যের বাজার থেকে মুনাফা লুট এবং অতিরিক্ত রাজস্ব আদায়ের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার কারণে জনমানুষের ভোগান্তি চরমে পৌছে। পরিণতিতে মারাত্নক দুর্ভিক্ষপীড়িত এলাকাগুলো হয়ে পড়ে জনশূন্য। তারা ভিটেমাটি ছেড়ে বাংলার পশ্চিম সংলগ্ন মালদা ও বিহার অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করে। এমশঃ মালদা, মুর্শিদাবাদ, বিহারের কাটিহার, পূর্ণিয়া, আরারিয়া ও ফরবেশগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। এ সকল অঞ্চল নেপাল সংলগ্ন হওয়ায় কালক্রমে এসব পরিবার নেপাল চলে যায়। অধিকতর শান্ত ও প্রাকৃতিকভাবে

বসবাস উপযোগী তরাই[১৭] অঞ্চলে বাঙালি মুসলমানদের যাওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। ভাগ্যন্বেষী এ সকল মানুষকে নিয়ে প্রবাদ রচিত হয়–

‘পালিয়ে গেলে নেপাল,
সঙ্গে যাবে কপাল।’

চর্যাপদের যুগ থেকে নেপালের সাথে বাংলা ও বাঙালিদের নাড়ির যোগসূত্র লক্ষ্য করি। সেই হাজার বছরের পরিক্রমার আজও সে সম্পর্ক অটুট আছে। ইলিয়াস শাহের ‘আমলে সূচিত নেপালে মুসলমানদের বসতি স্থাপন আজ মোট জনসংখ্যার প্রায় ৫.৯% উন্নীত হয়েছে। এর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ বাঙালি মুসলমান। বর্তমানে নেপালে চারটি পৃথক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন মুসলিম সম্প্রদায় হিন্দু অধ্যুষিত নেপালী সমাজকে আলোকিত করে চলেছে। এরা হলো চৌরাতি, মাধেসী, কাশ্মিরী, তিব্বতি এবং বাঙালী মুসলমান।

১৭৫৭ সালে পলাশী যুদ্ধের বিপর্যয়ের পর বিশেষতঃ নিষ্ঠাবান মুসলিম সম্প্রদায় ব্রিটিশদের রোষানলে পড়ে। তারা সদাসর্বদা মুসলমানদের সন্দেহের চোখে দেখতো। এদের মামুলি কারণে অত্যাচার নির্যাতনের শিকার হতে হত। অগত্যায় এদের বৃহদাংশ আত্মসম্মান রক্ষার্থে নেপালে পাড়ি জমায়। পলাশী যুদ্ধের ৭৪ বছর পর ১৮৩১ সালে মুসলমানদের সামনে উপস্থিত হয় আর এক প্রপঞ্চ বালাকোটের যুদ্ধ। একদিকে ব্রিটিশ আধিপত্যবাদের খড়গ, অন্যদিকে ইসলামি জীবনাচরণে অনৈসলামিক আক্বীদা ও বিশ্বাসের জঞ্জাল সমাজকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। শির্ক ও বিদআতের সয়লাব ওয়াহাদানিয়াতের ভাবধারাকে তছনছ করে ফেলেছিল। এমনি একটি ত্রিশঙ্কু অবস্থায় ব্রিটিশ বিতাড়নই একমাত্র উপায় জ্ঞান করে বালাকোটের সম্মুখ সমরে অবতীর্ন হয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক ভাবে এই যুদ্ধে পরাজিত হয়ে দিগ্বিদিক ছড়িয়ে পড়ে। এদেরই একটা অংশ নেপালে অভিবাসিত হয়। বালাকোটের যুদ্ধে অংশগ্রহণকরী অধিকাংশই ছিলেন সালাফী ভাবধারায় উজ্জীবিত ছিলেন। নেপালের রহমানিয়া মাদ্রাসা ও মসজিদসমূহ তাঁদেরই কর্মপ্রেরণার ফসল হিসেবে আজও সগৌরবে টিকে আছে।

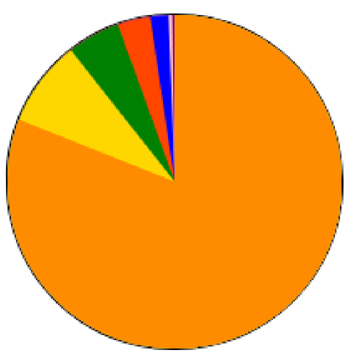

**নেপালে বিদ্যমান ধর্মসমূহের শতকরা হার**
হিন্দু ৮১.১৯%
বৌদ্ধ ৮.২১%
ইসলাম ৫.০৯%
কিরাত ৩.১৭%
খ্রিষ্টান ১.৭৬%
প্রকৃতি পূজঁক ০.৩৫%
বন .০২৩%
শিখ ০.০১%
জৈন ০.০১%

উৎস: Majupuras, Religion in Nepal.(2021)

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে সিপাহি বিদ্রোহের ফলে ব্রিটিশ সরকার মুসলমানদের প্রতি নির্যাতন বৃদ্ধি করলে নিরুপায় মুসলমানেরা নেপালের তরাই অঞ্চলের পাড়ি জমায়। বলাবাহুল্য চতুর্দশ শতক হতে বিহার ও

ত্রিহুত সন্নিহিত এতদঅঞ্চলে মুসলমানদের বসতি ছিল। সেখানে বিতাড়িত মুসলমানদের স্বাগত জানানো হয় এবং ক্রমশঃ বিভিন্ন উপলক্ষে মুসলমানদের অভিবাসন অব্যাহত থাকে।

ব্রিটিশ শোষণ ও নির্যাতন বাঙালি মুসলমানদের যেন পিছু ছাড়ছিলো না। ১৯৪৭ সালের দেশভাগ ও পঞ্চাশের মন্বন্তর সবমিলিয়ে মুসলমানদের কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়। বলা হয়, পঞ্চাশের মন্বন্তরে ৩৫ লাখ লোক প্রাণ হারিয়েছিলো। খাদ্য কষ্টে নিপতিত হয়ে তারা দিগ্বিদিক ছড়িয়ে পড়ে। এরই একটা অংশ নেপালে আশ্রয় নেয়।[২০]

আমাদের ধারণা, ঊনবিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এতদঞ্চলে ব্যাঙালী মুসলমানদের ব্যাপক আগমন ঘটে। বিশেষতঃ সবসাবাদ তথা বৃহত্তর রাজশাহী, মালদহ ও মুর্শিদাবাদ থেকে এরা অভিবাসিত হন।[২১] তরাই অঞ্চলটির প্রাকৃতিক পরিবেশ ও উর্বরা বৈশিষ্ট্য এদের আকৃষ্ট করে। অঞ্চলটি হিমালয়ের পাদদেশে পূর্ব-পশ্চিমে প্রলম্বিত একটি সমতল ভূমি। এটি বাঁকে জেলায় অবস্থিত। বাঁকে জেলার কপিলাবস্তু, কপানদেহি, পারসা, বাড়া, বৌহাটি, সিরাহা, সুনসারি, পশ্চিম তরাই এবং সাপ্তারি প্রভৃতি অঞ্চলে এসে বসবাস শুরু করে। তরাই অঞ্চলের বিস্তীর্ণ জঙ্গল পরিষ্কার করে কৃষিকার্য শুরু করে। ক্রমশ কৃষি অর্থনীতিতে উন্নতি করায় স্থানীয় নেপালীদের আনুকূল্য লাভ করে। কৃষিকার্যের প্রয়োজনে নানা অঞ্চল থেকে ব্যাপকহারে মুসলমান শ্রমিকদের সমাগম ঘটে। পরিবারের স্বাচ্ছন্দ্য আনয়নের জন্য কৃষিকাজের পাশাপাশি এরা ছোট খাটো ব্যবসায়-বাণিজ্য করে থাকেন। প্রাবন্ধিক এমনি একটি পরিবারের বিষয় সবিশেষ অবগত আছেন- যে, আধুনিক চাঁপাইনবাগঞ্জের শিবগজ্ঞ উপজেলার হাউসনগর একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। এখানে কয়েক পুরুষ যাবৎ মোল্লা পরিবারের বসবাস। বিংশ শতকের শুরুতে এ পরিবারে একটা অংশ আব্দুর রহীম বক্স মোল্লার নেতৃত্বে মালদহ জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার সোনাকুলে বসতি স্থাপন করেন। সেখান থেকে অধিকতর সুবিধা মনে করে তদানীন্তন পূর্ণিয়া জেলার কুট্টি গোলায় অভিবাসিত হন। কিছু দিন পর সেখান থেকে নেপালের সীমান্ত ঘেঁষে অবস্থিত ধরমগঞ্জ চলে যান। ধরমগঞ্জ নেপাল সীমান্তবর্তী একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। গ্রামটির সকলেই সরসাবাদের অন্তর্ভুক্ত চাঁপাইনবারগঞ্জের বাসিন্দা ছিলেন। পূর্ব থেকেই নেপালে অবাধ যাতায়াত ছিল।

কৃষি কাজের পাশাপাশি ব্যবসায় এদের পেশা। গো-শকটে পণ্য পরিবাহক হিসেবে নেপালে যাতায়াত ছিল। বড় বড় মহাজনদের মালামাল পরিবহণে এদের জুড়ি ছিলনা। বিশ্বস্ত, সাহসী, পরিশ্রমী ও কষ্ট সহিষ্ণু জাতি হিসেবে এদের খ্যাতি ছিল। আজকের মত পরিবহন ব্যবস্থা উন্নত না থাকায় গো-শকটে মালামাল পরিবহন নিরাপদ মনে করত। এক সাথে ১৫/২০টি গাড়ি পণ্য সামগ্রী বোঝায় করে গন্তব্যে পৌছুতে ৮/১০ দিন সময় ব্যয়িত হতো। উল্লিখিত পরিবারটির নেতৃপুরুষ আব্দুর রহীম বক্স ইন্তেকাল করলে পরিবারটি পূর্নবার পূর্নিয়া জেলার কিষানগঞ্জে পূনর্বাসিত হন। গ্রামের নাম সামদহ। থানা কিষানগঞ্জ। থানাটি অধুনা জেলায় রুপান্তরিত হয়েছে। সেখানে থেকে ওই সম্প্রদায়ের মানুষেরা মালামাল পরিবহনের পেশা অব্যাহত রেখেছিলেন। কিষানগঞ্জ থেকে আরারিয়া, ফরবেশগঞ্জ হয়ে যুগবানী পর্যন্ত কয়েক'শ কিমি. দুরবর্তী স্থানে মালামাল পরিবহন করতেন।

একটি সূত্রে অবগত হওয়া যায় যে, বলদবাহী পণ্য বিক্রেতা হিসেবেও এরা ব্যবসা করতেন। বলদের পিঠে বাহারী পণ্য সামগ্রী নিয়ে গ্রামে গ্রামে ফেরি করতেন। বৃটিশ আমলে অবিভক্ত বাংলা বিহার অঞ্চলে বলদবাহী পণ্য বিক্রেতার সন্ধান মেলে। এরা 'মুকেরী'[২২] নামে অভিহিত হতেন। গবেষকের পিতা হাজি মো. সেতাবউদ্দিন (৭৫) তা স্বচক্ষে অবলোকন করেন। আব্বাসীয় আমলেও মধ্যপ্রাচ্যে এধরনের বলদবাহী পণ্য বিক্রেতা সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়।

প্রতিষ্ঠানিকভাবে মাতৃভাষা চর্চার ব্যবস্থা না থাকায় এদের অধিকাংশ আওয়াধী, ভোজপুরি ও মৈথিলী ভাষায় কথা বলে। তবে নিজেদের মধ্যে ও বাড়িতে বাংলা ভাষায় কথা বলে। বিহার ডিস্ট্রিক্ট গেজেটেয়ার সূত্রে জানা যায় যে, 'Apparently they know Urdu but they speak a sort of Bengali language fluently in their family. The main occupation is agriculture or selling labour. Some of them cultivate the land on bataidari.'[২৩]

নেপাল ঐতিহাসিকভাবে ঘোষিত হিন্দু রাষ্ট্র। ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে নেপালের সংবিধানে নেপালকে একটি হিন্দু রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয়। সাংবিধানে একজন হিন্দু রাজার অধীনে নেপাল শাসিত হয়ে মর্মে স্বীকৃতি প্রদান করে। ২০০৮ সালের মে মাস পর্যন্ত নেপালে একটি সাংবিধানিক রাজতন্ত্র ছিল। ওই মাসের ২৮ তারিখে নেপালের আইনসভা সংবিধানে সংশোধন আনে এবং নেপালকে একটি প্রজাতন্ত্রে রুপান্তরিত করে। নেপালে জাতীয় পরিষদে পাঁচজন মুসলিম প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছে। এতে রাজনৈতিক শক্তিমত্তা অর্জনের পাশাপাশি সংবিধানিক মর্যাদা নিয়ে টিকে থাকার সুযোগ অবারিত হয়। প্রাচুর্য ও প্রভাব প্রতিপত্তির দিক থেকে নেপালি মুসলমানরা পিছিয়ে থাকলেও তারা নিজেদেরকে নিরাপদ মনে করেন।

জনসংখ্যার অধিকাংশ হিন্দু হওয়ার কারণে হিন্দু ধর্মমতের প্রভাব বেশি। অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা, শিক্ষা ক্ষেত্রে অনগ্রসরতা এবং ধর্মীয় জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণে মুসলিম সমাজ-সংস্কৃতিতে হিন্দু সমাজ ও সংস্কৃতির প্রভাব বিদ্যমান। পরিবেশগত কারণে অমুসলিম রীতিনীতির বিদ্যমানতা চোখে পড়ার মতো। ভাষা, পোশাক-পরিচ্ছদ, বাহ্যিক চলাফেরা, আচার-আচরণে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে পার্থক্য করা কঠিন হয়ে পড়েছে। বিবাহ-শাদীতে হিন্দুয়ানী রীতির প্রচলন ঘটেছে।নিকট সম্পর্কের ব্যক্তির মৃত্যুতে মাথা নেড়া করা, চল্লিশা পালন মুসলমানদের নিত্য সংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছে। মৃত ব্যক্তির দাফনে বিশুদ্ধ হাদীসের আলোকে প্রদর্শিত বিধানের ব্যত্যয় লক্ষণীয়। কারবালা দিবসে তাজিয়া বের করা, হায় হোসেন মাতম, জিঞ্জির দিয়ে রক্ত ঝরানো প্রভৃতি নিষ্ঠুরতম বিধান চালু রয়েছে।

নেপালে মুসলমানদের মধ্যে পেশাগত জাতিভেদের পাশাপাশি সৈয়দ, শেখ, মুঘল, পাঠান প্রভৃতি বংশীয় মর্যাদার বিভাজন দেখতে পাই। পশ্চিমাঞ্চলের পাহাড়ি এলাকায়, মির্জা ও ফকিরি বংশের প্রভাব দেখা যায়। পীর-মুরিদীর প্রচলন ইসলামের তাওহীদি ভাবনার বিপরীতে গড়ে উঠা জঞ্জাল নেপালেও দৃশ্যমান। তবে অধুনা, বিশ্বব্যাপী সালাফদের তৎপরতার ফলশ্রুতিতে তৌহিদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নেপালী মুসলমানরা কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে জীবন পরিচালনায় আগ্রহী হয়ে উঠেছে। শির্ক ও বিদআতের বিরুদ্ধে জমঈয়তে আহলে হাদীস, নেপালের তৎপরতা কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর দিকে নেপালী মুসলমানদের আকৃষ্ট করে চলেছে।

নেপালে মুসলমানদের সীমিত পরিসরে প্রাথমিক শিক্ষা লাভের সুযোগ বিদ্যমান। উচ্চশিক্ষার হার কম। তবে মুসলমানদের মাঝে ঐতিহ্যিকভাবে প্রচুর সংখ্যক ধর্মভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থায় মুসলমান শিক্ষার্থীদের অংশ গ্রহণ সামান্যই বলা যায়। সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ১৯৪১ সালে কাঠমাভুতে নিম্নমাধ্যমিক ইসলামি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। সানসারী জেলায় আল জামিয়াতুল ইসলামিয়া নামে একটি আলিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। নেপালে মুসলমানগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে আল মারকাযুল ইসলামী, কাঠমন্ডু, খুরখা মাদ্রাসা, মাজহারুল উলুম, মদীনা মসজিদ মাদ্রাসা, ঘাটিয়াল, কাঠমন্ডু জুমু'আহ্ মসজিদ। বর্তমানে নেপালে ৪ হাজার মাদ্রাসা ও ৪৩০টি মসজিদ রয়েছে।

নেপালী মুসলমানগণ মর্যাদার সাথে টিকে থাকার তাগিদে গড়ে তুলেছে ইসলাম সংঘ, নেপাল, দ্য নিউ মুসলিম ন্যাশনাল, মুসলিম খ্রিস্টান অ্যালায়েন্স, দ্য ন্যাশনাল মুসলিম ওমেন্স কাউন্সিল। ইসলাম সংঘ নেপাল মুসলমানদের সবচেয়ে বড় সংগঠন। সংগঠনটির মধ্য দিয়ে মুসলমানগণ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, মসজিদ মাদ্‌রাসা নির্মাণসহ বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক কাজ করে আসছে। ইসলাম বিষয়ক পুস্তক রচনা, অনুবাদ ও প্রকাশ করে সংঘ্যালঘু মুসলিম সমাজে প্রকৃত কল্যাণ সাধন করে চলেছে। এছাড়া ধনাঢ্য মুসলমানদের সহযোগিতায় কিছু সংখ্যক সাহায্য ও সেবা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এগুলোর মধ্যে আল ফালাহ দাতব্য সংস্থা, কপিলাবস্তু ইসলামী ওয়েলফেয়ার সোসাইটি, জানাকপুর মিল্লাত ওয়েলফেয়ার সোসাইটি, সানসার ও মুসলিম স্টুডেন্টস ফেডারেশন কাঠমান্ডু। নেপালে মুসলমানরা নানা শ্রেণিতে বিন্যাসিত হলেও স্বদেশকে বড় ভালোবাসে। নেপালীদের মতো শান্তি প্রিয় জাতি হিসেবে মুসলমানরাও খ্যাতি অর্জন করেছে। তারা নিজেদের নেপালি হিসেবে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করে। এসব ক্ষেত্রে বাঙালি মুসলমানদের অগ্রনী ভূমিকা প্রশংসনীয়।

সার্কভুক্ত দেশ হওয়ায় বাংলাদেশের সাথে নেপালের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। বাংলা একাডেমির সাথে Memorandum of Understanding Between Bangla Academy, Bangladesh and Nepal Academy কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। নেপালের কাঠমান্ডুতে অনুষ্ঠিত 2nd China-South Asia Literature Forum Trans Himalayan Litarary and Cultural Connectivities শীর্ষক কর্মশালা পরস্পরের সাথে সাংস্কৃতিক নৈকট্য অর্জনে সহায়তা করছে। সম্প্রতি ইউনেস্কোর আনুকূল্যে ইতিহাস বিষয়ক সেমিনার ত্রিভূবন বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। বাংলা ও বাঙালির দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যিক সম্পর্কের শেকড়ে বারি সিঞ্চন নেপাল বাংলাদেশ সম্পর্ককে আরো জোরদার করবে। অচিরেই পৃথক জাতিসত্বার গর্বিত আত্মপরিচয়ে নেপালে বাঙালি মুসলমানেরা মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে।

**তথ্যনির্দেশ ও পাদটীকা**

১. একটি নির্ভরযোগ্যসূত্রে অবগত হওয়া যায় যে, তিব্বতগামী কাশ্মীর মুসলিম ব্যবসায়ীরা পনের শতকের শুরুতেই নতুন আঙ্গিকে নেপালে ইসলামের দাওয়াত দেন। রাজা রত্নমাল্লার যুগে তাদের অনেকেই কান্তিপুর (কাঠমণ্ডু), বাখতাপুর ও লালিতপুরে স্থায়ী হন। রাজপ্রাসাদ থেকে কয়েকশ গজ দূরে অবস্থিত কাশ্মিরী তাকিয়া মসজিদ পাঁচশত বছর অতীতের যেন নির্বাক সাক্ষী। মসজিদের প্রাঙ্গনে শুয়ে আছেন বেগম হযরত মহল। তাঁর সমাধি একই সঙ্গে নিঃস্বতা ও অতীত মহিমার প্রতিচ্ছবি। বেগম হযরত মহল ছিলেন ভারতের অযোধ্যার রাণী। তিনি ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লবের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বিপ্লব ব্যর্থ হলে তিনি লক্ষ্ণৌ থেকে অনুগামী সমভিব্যবহারে নেপালে আশ্রয় নেন। নেপালের তৎকালীন শাসক রাজা জংবাহাদুর রানা তাঁকে আশ্রয় দেন। ব্রিটিশ সরকারের পৌষ্য হিসেবে পরিচিত নেপালের রাজ পরিবারের এই সিদ্ধান্ত ছিল অভাবনীয়।

২. ইসলামের প্রারম্ভিক যুগে চিনে ইসলাম প্রচার মুসলমানদের আগমন ঘটে ভিন্ন পথে। চিনের ক্যান্টনে মহানবী (সাঃ)-এর মামা সা'আদ বিন আবী ওয়াক্কাসের মাজার তার প্রমাণ বহন করে। উমাইয়া খিলাফতকালে (৬৬১-৭৫০) সেনাপতি কুতায়বা বিন মুসলিম অক্সাস গিরিমালা অতিক্রম করে মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল করায়ত্ব পূর্বক চিন পর্যন্ত অগ্রসর হন। ৭৫৬ খ্রিস্টাব্দে চিনের অভ্যন্তরীণ অরাজকতা নিরসনের জন্য সম্রাট সু সাং 'আব্বাসীয় (৭৫০-১২৫৮) খলিফা আল মানসুরের সাহায্য প্রার্থনা করেন। খলিফা আবু জাফর আল মানসুর চিনে একটি সেনা ইউনিট প্রেরণ করেন। সফলতার সাথে সেনাদল বিদ্রোহীদের কবল হতে সিনগানফু ও হুনানফু শহর দুটি পুনরুদ্ধারে সম্রাটকে সহায়তা করে। ফলক্রতিতে খলিফার সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠে। এভাবে চিনে মুসলমানদের প্রবেশ ও বসতি বিস্তার লাভ করে।

৩. আব্দুল মমিন চৌধুরী, 'ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ : বহু ভাষাবিদ-শিক্ষক ও দার্শনিক', *এ এস বি ৭২তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী দিবস বক্তৃতা*, ঢাকা : এ এস বি, পৃ. ৪
৪. চর্যাপদসমূহে তদানীন্তন বাংলার প্রাকৃতিক ও ভৌগলিক বিবরণসহ অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অবস্থার চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে।
৫. ১৮৭৩-৭৪ সালে বিহার প্রদেশে দুর্ভিক্ষ সংঘটিত হয়। ব্রিটিশ ভারতের বিহার প্রদেশ সংলগ্ন বাংলা ও তার পার্শ্ববর্তী প্রদেশগুলো বিশেষতঃ উত্তর পশ্চিম প্রদেশ অযোধ্যা অঞ্চল খরাজনিত এই দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে। প্রায় ১,৪০,০০০ বর্গ কিমি. অঞ্চল এবং ২১.৫ মিলিয়ন জনগণ এই দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত হয়। দ্র. *Imperial Gazetteer of India, 1907,* p. 15
৬. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, *কবি কঙ্কন চন্ডী, প্রথম ভাগ*, শ্রী কুমার বন্দোপাধ্যায় ও বিশ্বপতি চৌধুরী সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৯৬২, পৃ. ২৯
৭. পৃথিবীর সর্বোচ্চ ১০টি পর্বতের ৮টিই নেপালে অবস্থিত। এখানেই পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্ট অবস্থিত।
৮. উদ্ধৃত, সুখময় মুখোপাধ্যায়, *বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর : স্বাধীন সুলতানদের আমল*, কলিকাতা ১৯৯৬, পৃ. ২২
৯. *পূর্বোক্ত*
১০. Jayaswal, 'Kathmandi Inscriptions', *Journal of The Bihar and Orissa Research Society, Vol. XX11,* Calcutta, 1939
১১. Shams-i-Shiraj Afif, *Tarikh-i-Firujshahi (ed.),* Vilayet Husain, Calcutta 1980, pp. 114-118
১২. হোসেন শাহী 'আমলে বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে ধর্মেরও এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ব্রাহ্মণ্যধর্ম, বৈষ্ণবধর্ম ও শৈবধর্ম ছাড়াও এ যুগে বহু আঞ্চলিক ধর্মীয় মত ও সম্প্রদায়ের জনপ্রিয়তা দেখা যায়। পুরা সালতানাতে সৌহার্দ্যপূর্ণ আন্তঃধর্মীয় সম্পর্ক সহবস্থানের চমৎকার ধারা গড়ে উঠে। (দ্র. মো. ওসমান গনী, *সুলতানি বাংলার প্রাত্যহিক জীবন*, অপ্রকাশিত পি-এইচডি অভিসন্দর্ভ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৯, পৃ.৭১)
১৩. মুহাম্মদ ইউসুফ হোসেন, *নীল বিদ্রোহের নানা কথা*, ঢাকা ১৯৯০, পৃ. ১৯
১৪. আনোয়ার হোসেন, 'ইতিহাসের গাঁথামালা', *প্রথম আলো*, ২৩ নভেম্বর, ২০২৩, পৃ ১৬
১৫. মহ. আব্দুল অহাব, 'শেরশাহবাদিয়াদের আদি বাসভূমি সরসাবাদ : মুঘল আমলের ইতিহাস', *International Journal of Creative Research Thoughts, (IJCRT)*, Vol. 10, 2022, p. 771
১৬. আনোয়ার হোসেন, *পূর্বোক্ত*, পৃ.১৬
১৭. *কুরআন*, ৬২ : ১০
১৮. এস এম মোস্তাফিজুর রহমান, *নবাব সলিমুল্লাহ : সমাজ ও রাজনীতি*, ঢাকা ২০১৯, পৃ. ৩৮-৩৯
১৯. তরাই (Tarai) হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত জলাভূমি, তৃণভূমি, তৃণভূমি, সাভানা ও অরণ্যময় বলয় অঞ্চল। এটি হিমালয় পর্বতমালার দক্ষিণে এবং গাঙ্গেয় সমভূমির উত্তরে অবস্থিত। অঞ্চলটি পশ্চিমে যমুনা নদী ধরে ভারতের হিমাচল প্রদেশ, হরিয়ানা, উত্তরাখণ্ড থেকে পূর্বে উত্তর প্রদেশ ও বিহার রাজ্য পর্যন্ত বিস্তৃত।
২০. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, ফিরে দেখা ইতিহাস, *অন্য আলো*, ৫ জুলাই ২০২৪, পৃ. ৫
২১. এই মুসলিম সম্প্রদায় সমগ্র পশ্চিম বাংলা, বিহার ও দক্ষিণ নেপালে বসবাস করছে। ভারতে এরা শেরশাহবাদিয়া প্রভৃতি নামে পরিচিত। ১৯৪৭ এর দেশ বিভাগের সময় বেশ কিছু সংখ্যক শেরশাহবাদিয়া, ভারত থেকে সম্পদ বদল করে তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তানে পাড়ি জমায়। কঠিন পরিশ্রমী ও কষ্ট সহিষ্ণু শক্তিশালী সাহসী জাতি হিসেবে এদের সুখ্যাতি আছে।
২২. Abdul Jabbar Khan, 'Mukaris: A Group of Transport Workers in the Abbasid Middle East', *Journal of the Pakistan Historical Society, Vol. XXIII,* pp. 142-151
২৩. *Bihar District Gazetteer,* Purnea, 1963, p. 152